গার্মেন্টস শিল্পে অশনি সংকেত

মাহবুব আলম

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সিংহভাগই আসে পোশাক রপ্তানি থেকে। ফলে রপ্তানিকারক গার্মেন্টস মালিকদের রমরমা অবস্থা। যার একটা গার্মেন্ট ছিল এখন তার দুটো। যার দুটো ছিল তার চারটা। আর যার চারটা ছিল তার ১০/১২টা হয়েছে। সেইসঙ্গে এই মালিকদের একটার জায়গায় একাধিক গাড়ি-বাড়ি, এমনকি অনেকের বাগান বাড়ি হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেকে আবার বিদেশে বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছেন। সেই সাথে বিলাসী জীবন-যাপন তো আছেই। এরা পরিবারসহ প্রায়ই প্রমোদ ভ্রমণ করেন। পুত্র-কন্যাদের ইউরোপ, আমেরিকায় লেখাপড়া করান।

অন্যদিকে, যে শ্রমিকরা এই পোশাক তৈরি করেন, যাদের রক্ত-ঘামে মালিকের বিলাসবহুল জীবনযাপন, যাদের শ্রমে-ঘামে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয়, যা দেশের আর্থিক ভিতকে শক্তিশালী করেছে সেই শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাও যুগের পর যুগ। অথচ এ বিষয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। শুধু সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই নয়, এই বিষয়ে আমাদের শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক দল, সংগঠনসহ সুশীল সমাজের দাবিদার কথিত বুদ্ধিজীবী, এমনকি সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমও নিশ্চুপ। শুধু তাই নয়, এই শ্রমিকরা যখন মানবেতর জীবন থেকে বের হবার জন্য মজুরি বৃদ্ধি দাবি করে, কারখানার উন্নত পরিবেশের দাবি তোলে, তখন এই কথিত সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন এমনকি পেশাজীবীরা ষড়যন্ত্রের ধুয়া তুলে শ্রমিকদের আন্দোলন থামাতে দমাতে মালিকদের পাশে দাঁড়ায়। মালিক ও সরকারের দমন-পীড়ন নির্যাতনের সহযোগী হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে শ্রমিকরা রপ্তানিমুখী শিল্পে কাজ করে, যে শ্রমিকরা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সর্বাধিক ভূমিকা রাখে, সেই শ্রমিকরা কেন মানবেতর জীবনযাপন করে? কারণ বেতন কম। এত কম যে রীতিমতো অবিশ্বাস্য। এই বেতন সরকারি অফিসে একজন পিয়ন বা সরকারি হাসপাতালের আয়া-বুয়ার বেতনের প্রায় অর্ধেক। বর্তমানে সরকারি চাকরিতে ঢুকলেই একজন পিয়ন বেতন তোলে ১৬ হাজার টাকা। সেখানে একজন গার্মেন্টস শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন ৮ হাজার টাকা। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়।

সম্প্রতি আন্দোলনরত এক নারী গার্মেন্টস শ্রমিক বলেছেন, "আমি গত ১১ বছর ধরে মেশিন অপারেটর হিসেবে কাজ করছি। বর্তমানে আমার বেতন ১০,৭০০ টাকা। সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করি। আমার দুই সন্তানকে ঘরে রেখে কাজে আসি। এই টাকায় মাসের ১৫ দিনও চলে না।" চলার কথাও নয়। বিশেষ করে দুর্মূল্যের বাজারে। চলেও না। তাই তাদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়। জীবনযাপন করতে হয় দারিদ্রসীমার নিচে।

এখানে উল্লেখ্য, পোশাক শিল্প শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্যান্য দেশেও এই শিল্প আছে, আছে পোশাক শ্রমিক। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, সারা দুনিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকরা সবচেয়ে অবহেলিত, সবচেয়ে কম বেতন পান। এই বিষয়ে সিপিডির দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, চীনে গার্মেন্টস শ্রমিকের সর্বনিম্ন বেতন ৩০৩ দশমিক ৫৯ ডলার, ইন্দোনেশিয়ায় ২২৪ দশমিক ৯৪ ডলার, কম্বোডিয়ায় ২০০ ডলার, ভারতে ১৭১ দশমিক ১৮ ডলার, ভিয়েতনামে ১৭০ দশমিক ৩৫ ডলার, পাকিস্তানে ১১০ দশমিক ৫৯ ডলার, নেপালে ১৫০ ডলার, আর বাংলাদেশে ৭২.৪২ ডলার।

বাংলাদেশ যাদের কাছে বা যেসব দেশে পোশাক রপ্তানি করে উপরোক্ত দেশগুলোও কম-বেশি সেই সব দেশেই পোশাক রপ্তানি করে। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে ওরা যদি শ্রমিকদের ১৫০, ২০০, ৩০০ ডলার বেতন দিতে পারে তাহলে বাংলাদেশে ওই রকম বেতন দিতে বাধা কোথায়? বাধা একটাই, তাহলো গার্মেন্ট মালিকদের শক্তি। ওরা এতো শক্তিশালী, এত শক্তিধর যে ওরা মানুষকে মানুষই মনে করে না। ওরা শ্রমিকদের দাস মনে করে। আর তাইতো গার্মেন্ট কারখানার নামে জতুগৃহ তৈরি করে। এমন কারখানা তৈরি করে যে ছয় তলা বিল্ডিংয়ে কয়েকজন ধাক্কা দিলেই তা ভেঙে পড়ে। আগের দিনে দাস যুগে যেমন শ্রমিকদের পায়ে শিকল পরিয়ে কাজ করানো হতো, ঠিক তেমনি আমাদের গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকদের কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়ে বাহিরে থেকে তালা বন্ধ করে রাখে। তারা সস্তা শ্রমকে অর্থবৃত্তের প্রধান উৎস হিসেবে দেখছে। আর এই সস্তা শ্রমের ওপর গড়ে উঠেছে ৮৭ বিলিয়ন ডলারের শিল্প। যে শিল্পের উপর ভর করে মালিকরা চরম

বিলাসিতা করছে। আর সরকার এই শিল্পের উপর ভর করে নিশ্চিন্তে সরকার পরিচালনা করছে।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে। শ্রমিকদের এই জোরালো আন্দোলনে শুধুমাত্র নভেম্বর মাসেই (২০২৩) পুলিশের লাঠি, গুলি ও টিয়ার গ্যাসে চারজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে শত শত। এতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কিছুটা টনক নড়েছে। আন্দোলনের মুখে সরকার ৬ বছর আগেই বেঁধে দেওয়া সর্বনিম্ন মজুরি ৮,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১২,৫০০ টাকা নির্ধারণ করেছে। শ্রমিকদের ২৫ হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরি দাবির বিপরীতে সরকার সাড়ে বারো হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরি ঘোষণা করেছে। সেইসাথে হুমকি দিয়েছে, এই মজুরিতে কাজ না করলে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে, সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ৩০০ কারখানা বন্ধ করেও দিয়েছে মালিকরা। সেই সাথে মালিকরা 'কাজ না করলে বেতন নেই' নিয়ম জারি করেছে। যা শ্রম আইনের লঙ্ঘন ও মানবতাবিরোধী অপরাধ। এক কথায়, বেতন বৃদ্ধির সরকারি ঘোষণাকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা। আর এ কাজে সরকারের প্রচ্ছন্ন মদদও রয়েছে। কেন থাকবে না? যে দেশে ৩০০ সংসদ সদস্যের ১৬৮ জন গার্মেন্টস মালিক, সেই দেশে গার্মেন্টস মালিকদের পক্ষেই সরকার কাজ করবে এটাই তো স্বাভাবিক।

কাজ না করলে বেতন নেই। এ থেকে মনে হয় শ্রমিকরা কাজ না করেই বেতন নেয়। না, এটা মোটেও সত্য নয়। সরকার থেকে বলা হচ্ছে, কারখানায় বন্ধ হলে তো না খেয়ে মরতে হবে। সরকারের এই মনোভাবের পরে মালিকপক্ষ 'নো ওয়ার্ক নো পে' বা 'কাজ না করলে বেতন নেই' এই অমানবিক ব্যবস্থার চিন্তাভাবনা করছে। অবশ্য, এদেশের জাতীয় পত্রিকার দাবিদার এক মালিকের তিনটা পত্রিকায় এই অসভ্য বর্বর নিয়ম চালু আছে। স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন আসে তাহলে কি সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রমে এই নিয়ম চালু করা হবে। ওদের পেনশন ছুটি ছাটা বোনাস সব বাতিল হবে? গার্মেন্টস শ্রমিকদের ক্ষেত্রে 'নো ওয়ার্ক নো পে'র মতো বর্বর নিয়ম চালু হলে বা এই নিয়ম চালু করতে সফল হলে দুদিন বাদে ব্যাংকগুলোও যে এই নিয়ম চালু করবে না, সকল সংবাদপত্র যে এই নিয়ম চালু করবে না, বিভিন্ন কর্পোরেট হাউস যে এই নিয়ম চালু করবে না, সর্বশেষ সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও যে এই নিয়ম চালু হবে না তার গ্যারান্টি কোথায়?

ইতিমধ্যে বলেছি, একজন মালিকের তিনটা সংবাদপত্রে ওই নিয়ম চালু আছে বছরে পর বছর। এই প্রতিষ্ঠানে হাজিরা নেই তো বেতন নেই। এমন কি বাবা-মা মারা গেলেও ছুটি নেই। ছুটি নেই বলতে হাজিরা নেই তো বেতন নেই।

একশ্রেণির কারখানা মালিকদের শয়তানির শেষ নেই। ওরা নিরাপত্তার কথা বলে কারখানা বন্ধ করতে চাইছে। আসলে এসবই বেতন বৃদ্ধির দাবিকে পদদলিত করতে কূটকৌশল। মনে রাখতে হবে, কারখানা বন্ধ করলে শ্রমিকরা ঠিকই বিকল্প কাজ জুটিয়ে নেবে। কিন্তু মালিকদের কি হবে? বিলাস ব্যাসনের টাকা কোত্থেকে আসবে? ব্যাংকের ঋণ কিভাবে শোধ করবে? এমনিতেই ওরা ব্যাংক ঋণ নিয়ে ঋণের বড় অংশ বিদেশে পাচার করছে। এই পাচারকৃত অর্থ দেশে এনে ব্যাংকের ঋণ শোধ করবে? না, সে গুড়ে বালি। বিদেশে টাকা পাচার করা যত সহজ পাচারকৃত টাকা ফেরত আনা তত সহজ নয় বরং খুব কঠিন। সে ক্ষেত্রে মালিকদের জেলে যাওয়া ছাড়া বিকল্প থাকবে না। তাই শ্রমিকদের হুমকি দিয়ে লাভ নেই, লাভ হবে না।

সর্বশেষ যা বলার দরকার তা হলো, একশ্রেণির গার্মেন্টস মালিকরা অতি মুনাফার লোভে একের পর এক যে হটকারী, অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, চুরি ডাকাতি আর বেশুমার বিলাস ব্যাসনে মত্ত হয়েছে তাতে করে এই শিল্পের অপমৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেওয়ার উপক্রম হয়েছে। ইতিমধ্যে তার অশনিসঙ্কেত শোনা যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, কোনো শিল্পই চিরস্থায়ী নয়। এ দেশে একসময় তাঁত শিল্প ছিল। ছিল রেশম শিল্প। সেইসাথে ছিল মসলিন কাপড় ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প। মসলিন কাপড় তো জগৎবিখ্যাত ছিল। রেশম শিল্প ছিল তৎকালীন বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ বইতে হায়দার আকবর খান রনো লিখেছেন, 'বাণিজ্য পুঁজির যুগে ১৮১৪ সালে ভারত থেকে ব্রিটেনে ১২ লাখ কাপড় রপ্তানি হতো। যার বেশিরভাগ ছিল ঢাকার মসলিন কাপড়।' 'একইভাবে ১৮১৩ সালে ভারত থেকে ব্রিটেনে ৯০ লাখ পাউন্ড তুলা রপ্তানি হয়। ১৮৪৪ সালে তা বেড়ে হয় ৮৮০ লাখ পাউন্ড। ১৯১৪ সালে তা আরো বেড়ে হয় ১৬৩০ লাখ পাউন্ড।'

একসময় এই বাংলায় ভালো জাতের তুলা উৎপন্ন হতো। এরপর এক হিসাবে দেখা গেছে ১৮৩৩ সালে ভারত থেকে শুধুমাত্র ব্রিটেনে চার হাজার পাউন্ড পশমের কাঁচামাল রপ্তানি হয়। ১৮৪৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ লাখ পাউন্ড। আজ আমরা খাদ্য আমদানির দেশ অথচ একসময় আমরা খাদ্য রপ্তানি করতাম। ১৮৩৯ সালে তৎকালীন ভারতবর্ষ থেকে ৮ লাখ পাউন্ড খাদ্যশস্য রপ্তানি হয়। ১৯১৪ সালে তা বেড়ে হয় ১৯৩ লাখ পাউন্ড। এই রপ্তানিতে বাংলার অংশগ্রহণ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে ব্রিটিশ ছাড়াও বাংলার উৎপন্ন শিল্পজাত পণ্য যথা মসলিন কাপড়, সিল্ক, সুতি, কাপড় রপ্তানি হতো ফরাসি, রোমান ও অটোমান সাম্রাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে।

এইসব শিল্প ও রপ্তানি পণ্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সর্বশেষ পাট শিল্প বিলুপ্ত হয়েছে। যা ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও স্বাধীন বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস। মনে রাখতে হবে, স্বাধীন বাংলার শুরুর এক দশকে পাটজাত পণ্য থেকেই দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আসতো। যা দিয়ে সরকার তার আমদানি ব্যয় নির্বাহ করত। কিন্তু আজ সেই রামও নেই, নেই অযোধ্যাও। তাই বলছি, ৮৭ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি সম্ভাবনাময় গার্মেন্ট শিল্পের অপমৃত্যু না চাইলে কারখানা মালিকদের হঠকারিতা বন্ধ করতে হবে। শ্রমিকদের দাস বানিয়ে অতি মুনাফার লোভ নিবৃত্ত করতে হবে। তার পরিবর্তে শ্রমিকদের শ্রমের ন্যায্য মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের মানুষের মর্যাদা দিতে হবে। শ্রমিকদের পুত্র-কন্যাসহ পরিবারের সদস্যদের ন্যূনতম খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে লাঠিয়াল ও গুন্ডাপোষাসহ বিভিন্নভাবে শ্রমিক নির্যাতন ও শ্রমিক হত্যা বন্ধ করতে হবে।

সেই সাথে সরকারকেও মনে রাখতে হবে শ্রমিক হত্যা করে শ্রমিকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতন করে সরকার ঘোষিত মজুরি বাস্তবায়ন করা যাবে না। এ বিষয়ে খোদ সরকারের ১৪ দলীয় জোটের এক নেতা রাশেদ খান মেনন যথার্থই বলেছেন, শ্রমিক খুন করে ঘোষিত মজুরি বাস্তবায়ন করা যাবে না। তাই সরকারের কাছে আবেদন, সরকার ঘোষিত সর্বনিম্ন বেতন মজুরি পুনর্মূল্যায়ন করা হোক। এতে সরকারের পিছু হটা হবে না বরং সরকারের মহত্তই প্রদর্শিত হবে। এর ফলে শ্রমিকদের মানবেতর জীবনের অবসান হবে। শ্রমিকরা দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে আসবে।

বর্তমানে দেশে শতকরা ২৪ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। সরকার এই সংখ্যা কমিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেক্ষেত্রে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি যে আবশ্যক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া একজন কর্মজীবী মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে এটাই বা কেমন করে হয়। এটা তো অবিশ্বাস্য। আর তাইতো গার্মেন্টস শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি আন্তর্জাতিক সংস্থা সরকারের প্রতি সর্বনিম্ন বেতন পুনর্মূল্যায়নের আহ্বান জানিয়েছে। ১৯ নভেম্বর এক যৌথ চিঠিতে এই আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন বেতন এবং গড় জীবনধারনের খরচের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফারাক বিদ্যমান রয়েছে। এই বৈষম্য পোশাক খাতে আন্তর্জাতিক মাত্রা পূরণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি চ্যালেঞ্জ।

চিঠিতে এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, সাড়ে বারো হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরি মৌলিক চাহিদা ও শ্রমিকদের শালীন কাজের মান বজায় রাখার জন্য সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার বিপরীত। এছাড়া জেনেভাভিত্তিক বৈশ্বিক অধিকার গোষ্ঠী বলেছে, সরকার ঘোষিত ১২ হাজার ৫০০ টাকা সর্বনিম্ন মজুরি শোচনীয় রকম কম। এর মাধ্যমে শ্রমিকদের দারিদ্র্যসীমার মধ্যেই রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের এক শীর্ষ নেতা বলেছেন, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে ভালো মজুরি দিতে হবে। সত্যি তো আধপেটা খাওয়া শ্রমিক দিয়ে কিভাবে উৎপাদনশীলতা বাড়বে? এর বাইরে আরো একটি বিষয়ে মনে রাখতে হবে, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের বাজারের সঙ্গে। তাই উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও শলাপরামর্শ আমলে নিতে হবে। অন্যথায় সম্ভাবনাময় এই শিল্পের অপমৃত্যু রোধ করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে আগে হোক পরে হোক অপমৃত্যু অবধারিত।